আশ্চর্য প্রাণী (প্রোফেসর শঙ্কু)

১০ই মার্চ

গবেষণা সম্পূর্ণ ব্যর্থ। আমার জীবনে এর আগে এ রকম কখনও হয়নি। একমাত্র সান্ত্বিনা যে এটা আমার একার গবেষণা নয়, এটার সঙ্গে আরও একজন জড়িত আছেন। হামবোল্টও বেশ মুষড়ে পড়েছে। তবে এত সহজে নিরুদ্যম হলে চলবে না। কাল আবার উঠে পড়ে লাগতে হবে।

১১ই মার্চ

আজও কোনও ফল পাওয়া গেল না। যদি যেত, তা হলে অবিশ্যি সারা পৃথিবীতে সাড়া পড়ে যেত। কিন্তু সে সৌভাগ্য আমাদের হবে কি না সন্দেহ। আমি অবিশ্যি আমার হতাশা বাইরে প্রকাশ করি না, কিন্তু হামবোল্ট দেখলাম আমার মতো সংযমী নয়। আজ ল্যাবরেটরি থেকে বেরিয়ে এসে হঠাৎ কথা নেই বাতা নেই, ওর পোষা বিরাট গ্রেট ডেন কুকুরটার পাঁজরায় একটা লাথি মেরে বসল। হামবোল্টের চরিত্রের এ দিকটা আমার জানা ছিল না। তাই প্রথমটায় বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। তবে রাগটা বেশিক্ষণ ছিল না। মিনিট দিশেকের মধ্যেই তুড়ি মেরে নেপোলিয়নকে কাছে ডেকে মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। নেপোলিয়নও দেখলাম দিব্যি লেজ নাড়ছে।

আজ প্রচণ্ড শীত। সকাল থেকে কনকনে হাওয়া বইছে। বাইরেটা বরফ পড়ে একেবারে সাদা হয়ে রয়েছে। বৈঠকখানার ফায়ারপ্লেসের সামনে বসেই আজ দিনটা কাটাতে হবে। আমি জানি হামবোল্ট আমাকে আবার সুপার-চেস খেলতে বাধ্য করবে। সুপার-চেস, অর্থাৎ দাবার বাবা। এটা হামবোল্টেরই আবিষ্কার। বোর্ডের সাইজ ডবল। ঘুঁটির সংখ্যা ষোলোর জায়গায় বত্রিশ, ঘুঁটির চালচলনও দাবার চেয়ে শতগুণে বেশি জটিল। আমার অবিশ্যি

খেলাটা শিখে নিতে ঘণ্টা তিনেকের বেশি সময় লাগেনি। প্রথম দিন হামবোল্ট আমাকে হারালেও, কাল পর্যন্ত পার পর তিন দিন আমি ওকে কিস্তি মাৎ করে দিয়েছি। মনে মনে স্থির করেছি যে আজ যদি খেলতেই হয়, তা হলে ইচ্ছে করেই হারব। ওর মেজাজের যা নমুনা দেখলাম, ওকে একটু তোয়াজে রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

১২ই মার্চ

আজ প্রথম একটু আশার আলো দেখতে পেলাম। হয়তো বা শেষপর্যন্ত সত্যিই পৃথিবীর ইতিহাসে মানুষের হাতে প্রথম একটি প্রাণীর সৃষ্টি হবে। আজ মাইক্রোম্যাগনাস্কোপের সাহায্যে যে জিনিসটা ফ্লাস্কের মধ্যে দেখা গেল, সেরকম এর আগে কখনও দেখা যায়নি। একটা পরমাণুর আয়তনের cell জাতীয় জিনিস। হামবোল্ট দেখার পর আমি চোখ লাগানোর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই সেটা অদৃশ্য হয়ে গেল। ভাবগতিক দেখে সেটাকে প্রাণী বলতে দ্বিধা হয় না, এবং এটার সৃষ্টি হয়েছিল যে আমাদের গবেষণার ফলেই, তাতেও কোনও সন্দেহ নেই। হামবোল্ট প্রচণ্ডভাবে উত্তেজিত হয়েছিল। বলাই বাহুল্য। সত্যি বলতে কী, যন্ত্রটা থেকে চোখ সরিয়ে নেবার পরমুহূর্তেই ও আমার কাঁধে এমন একটা চাপড় মারে যে, কাঁধটা এখনও টিনটিন করছে।

কিন্তু যেটা দুশ্চিন্তার কারণ সেটা হল এই যে, প্রাণী যদি সৃষ্টিও হয়, তার অস্তিত্ব কি হবে শুধুমাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্য? তা হলো লাভটা কী হবে? লোককে ডেকে সে প্রাণী দেখাব কী করে? ইউরোপের অন্যান্য বৈজ্ঞানিকরা সে প্রাণীর কথা বিশ্বাস করবে। কেন?

যাকগে, এখন এসব কথা না ভাবাই ভাল। আমি নিজে এটুকু জোর দিয়ে বলতে পারি যে, আজ যে ঘটনা আমাদের ল্যাবরেটরিতে ঘটেছে, তার তুলনীয় কোনও ঘটনা। এর আগে পৃথিবীর কোথাও কোনও ল্যাবরেটরিতে কখনও ঘটেনি।

এই প্রাণী তৈরির ব্যাপারে আমরা যে-রাস্তাটা নিয়েছি, আমার মতে এ ছাড়া আর কোনও রাস্তা নেই। কোটি কোটি বছর আগে পৃথিবীতে যখন প্রথম প্রাণের সৃষ্টি হয়, বিজ্ঞানীরা অনুমান করতে পারেন তখন পৃথিবীর অবস্থাটা কীরকম ছিল। সেই অবস্থাটা ভারী ভয়ংকর। সারা পৃথিবীতে ডাঙা প্রায় ছিল না বললেই চলে। তার বদলে ছিল এক অগাধ সমুদ্র। পৃথিবীর উত্তাপ ছিল তখন প্রচণ্ড। এই সমুদ্রের জল টগবগ করে ফুটত। আজকাল বায়ুমণ্ডল পৃথিবীকে যেভাবে ঘিরে রয়েছে এবং তার আচ্ছাদনের মধ্যে মানুষকে অক্সিজেন, ওজোন ইত্যাদির সাহায্যে যেভাবে বাঁচিয়ে রেখেছে—তখন তা ছিল না। তার ফলে সূর্যের আলট্রাভায়োলেট রশ্মি সোজা এসে পৃথিবীকে আঘাত করত। হাইড্রোজেন নাইট্রোজেন সালফার কার্বন ইত্যাদি গ্যাস অবশ্যই ছিল, আর এইসব গ্যাসের উপর চলত বৈদ্যুতিক প্রভাবের খেলা। প্রলয়ংকর বৈদ্যুতিক ঝড় ছিল তখন দৈনন্দিন ব্যাপার। এই অবস্থাতেই পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের সৃষ্টি হয়।

আমরা আমাদের ল্যাবরেটরিতে যেটা করেছি। সেটা আর কিছুই নয়-একটা ফ্লাস্কের মধ্যে কৃত্রিম উপায়ে এই আদিম আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছি। আমার বিশ্বাস এই অবস্থাটা বজায় রেখে কিছুদিন পরীক্ষা চালাতে পারলে আমাদের ফ্লাস্কের মধ্যে একটি প্রাণীর জন্ম হবে, যেটা হবে মানুষের তৈরি প্রথম প্রাণী। এই প্রাণী জীবাণুর আকারে হবে এটাও আমরা অনুমান করছি, এবং জীবাণুরই মতো হবে এর হাবভাব চালচলন।

প্রোফেসর হামবোল্টের সঙ্গে এ ব্যাপারে কীভাবে জড়িত হলাম, সেটা বলি। জামানির ব্রেমেন শহরে একটা বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে আমি কৃত্রিম উপায়ে প্রাণসৃষ্টি সম্পর্কে একটা প্রবন্ধ পড়ি। সভায় হামবোল্ট উপস্থিত ছিলেন। এই বিখ্যাত বায়োকেমিস্টের লেখা আমি আগে পড়েছি। ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ ছিল না। বক্তৃতার পর নিজে এগিয়ে এসে আমার সঙ্গে আলাপ করলেন। আমারই

মতো বয়স, তবে লম্বায় আমার চেয়ে প্রায় এক হাত উঁচু। মাথায় চকচকে টাক, গোঁফ দাড়ির লেশ মাত্র নেই, এমনকী ভুরু বা চোখের পাতাও নেই।

হঠাৎ দেখলে মাকুন্দ বলে মনে হয়। কিন্তু হ্যান্ডশেক করার সময় হাতে সোনালি লোম লক্ষ করলাম।

সম্মেলনের অতিথিদের জন্য বক্তৃতার পর একটা বড় হলঘরে কফি ও কেক-বিস্কুটের ব্যবস্থা ছিল। ভিড় দেখে আমি একটা কোণে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি। মনটাও ভাল নেই, কারণ বক্তৃতার শেষে হাততালির বহর দেখে বুঝেছিলাম, আমার কথাগুলো শ্রোতাদের মনে ধরেনি। অর্থাৎ মানুষের হাতে প্রাণীর সৃষ্টি হতে পারে সেটা বৈজ্ঞানিকেরা মানতে চায়নি। তাই বক্তৃতার শেষে দু একজন ভদ্রতার খাতিরে প্রশংসা করলেও এগিয়ে এসে বিশেষ কেউই কথা বলছে না। এমন সময় প্রোফেসর হামবোল্ট হাসিমুখে এলেন আমার দিকে এগিয়ে। তাঁর হাতে দু পেয়ালা কফি দেখে বুঝলাম তার একটা আমারই জন্যে। কফি পেয়ে তাঁকে ধন্যবাদ দিলাম। জামান ভাষাতেই কথাবাত হল। হামবোল্ট তাঁর প্রথম কথাতেই আমাকে অবাক করে দিলেন

আমার পেপারটা আর পড়ার দরকার হল না।

তার মানে? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

তুমি যা বললে, আমারও সেই একই কথা।

আমি উৎফুল্ল হয়ে বললাম, তাতে ক্ষতি কী? এরা যখন আমার একার কথায় গা করছে। না, সেখানে দুজনে বললে হয়তো কিছুটা কাজ হবে।

হামবোল্ট মৃদু হেসে মৃদু স্বরে বললেন, এদের কিছু বলে বোঝাতে যাওয়াটা পণ্ডশ্রম। এসব ব্যাপারে কথায় কাজ হয় না, কাজ হয় একমাত্র কাজ দেখাতে পারলে। তুমি যা বললে, সেটা নিয়ে কিছু পরীক্ষা করেছ কি?

আমি বলতে বাধ্য হলাম যে আমার গিরিডির ল্যাবরেটরিতে যা সরঞ্জাম আছে তাই নিয়ে এই জটিল পরীক্ষায় নামা মুশকিল।

কোনও চিন্তা নেই? হামবোল্ট বললেন। তুমি চলে এসো আমার ওখানে।

কোথায়? হামবোল্ট কোথায় থাকতেন সেটা আমার জানা ছিল না।

সুইটজারল্যান্ড। আমি থাকি সেন্ট গালেন শহরে। আমার মতো ল্যাবরেটরি ইউরোপে আর পাবে না।

লোভ লাগল। এক কথায় রাজি হয়ে গেলাম। ৫ই মার্চ অর্থাৎ ঠিক সাত দিন আগে সেন্ট গালেনে পৌঁছেছি। সুইটজারল্যান্ডের সব শহরের মতোই এটাও ছবির মতো সুন্দর। কনস্ট্যান্স হ্রদের ধারে রোরশাক শহর থেকে ট্রেনে ন মাইল। প্রায় আড়াই হাজার ফুট উচুতে। প্রথম দিন একটু ঘুরে দেখেছিলাম শহরটা, তারপর গবেষণার কাজ শুরু হয়ে যাওয়াতে আর বেরোতে পারিনি। হামবোল্টের ল্যাবরেটরি সত্যিই একটা আশ্চর্য জিনিস। এ ধরনের গবেষণা এখানে ছাড়া সম্ভব ছিল না। এখন এটা সফল হলেই হয়। আজ যে খানিকটা আশার আলো দেখা দিয়েছে, তার জন্য আমি অনেকটা দায়ী। প্রোটোভিট্রোমাফিজেনারাস সলিউশনে নিউট্র্যাল ইলেকট্রিক বমবার্ডমেন্টের কথাটা আমিই বলেছিলাম। আমার বিশ্বাস তার ফলেই আজ কয়েক মুহূর্তের জন্য ওই পারমাণবিক প্রাণীটির আবিভব হয়েছিল। কাল বমবার্ডমেন্টের মাত্রাটা আর একটু বাড়িয়ে দেব। দেখা যাক কী হয়।

নাঃ-আজ আর লেখা যাবে না। এইমাত্র হামবোল্টের চাকর ম্যাক্স বলে গেল, তার মনিব সুপার-চেসের ঘুঁটি সাজিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছেন।

১৪ই মার্চ

কাল ডায়েরি লিখতে পারিনি। লেখার মতো মনের অবস্থাও ছিল না। তার মানে মনমরা অবস্থা নয়—একেবারে উল্লাসের চরম শিখর। এখনও ঘটনাটা পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছি না। ঘড়িতে যদিও রাত আড়াইটা, চোখে ঘুমের লেশমাত্র নেই। বার বার মন চলে যাচ্ছে হামবোল্টের ল্যাবরেটরির টেবিলের উপর রাখা ফ্লাস্কের ভিতরের আশ্চর্য প্রাণীটার দিকে। আমাদের যুগান্তকারী পরীক্ষার ফল। এই প্রাণী।

কাল সন্ধ্যা ছটা বেজে তেত্রিশ মিনিটে এই প্রাণী জন্ম নেয়। আমার বিশ্বাস আমার অনুমান অনুযায়ী বমবার্ডমেন্টের মাত্রাটা বাড়ানোর ফলেই এ প্রাণীর সৃষ্টি হয়েছে; যদিও এ বিষয়ে আমি হামবোল্টের কাছে কোনও বড়াই করিনি। তাই বোধ হয় তার মনটাও খুশিতে ভরে আছে। সে হয়তো ভাবছে তার কৃতিত্ব আমারই সমান। ভাবুক গিয়ে। তাতে কোনও ক্ষতি নেই। আমাদের গবেষণা সফল হয়েছে এইটেই বড় কথা।

শুধু প্রাণীর জন্মটাই যে কালকের একমাত্র আশ্চর্য ঘটনা, তা নয়। জন্মের মুহূর্তে যে সব ব্যাপারগুলো ঘটল, তা এতই অপ্রত্যাশিত ও অস্বাভাবিক যে, এখনও মনে পড়লে আমার শরীরে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। পাঁচ ঘণ্টা একটানা দুজনে ফ্লাস্কের দিকে চেয়ে বসে ছিলাম। বরফ পড়ছে, নেপোলিয়ন এসে ল্যাবরেটরির কাপেটের উপর বসেছে, ম্যাক্স সবেমাত্র কফি দিয়ে গেছে, এমন সময় হঠাৎ একটা বাজ পড়ার মতো প্রচণ্ড শব্দে আমাদের দুজনেরই প্রায় হার্টফেল হবার অবস্থা। অথচ আকাশে এক টুকরো মেঘ নেই; জানোলা দিয়ে বাইরে ঝলমলে রোদ দেখা যাচ্ছে। এই বজপাতের

সঙ্গে সঙ্গে আবার অনুভব করলাম। একটা এক সেকেন্ডের ভূমিকম্পের ঝাঁকুনি। তার তেজ এত বেশি যে, ঘরের জানোলা আর টেবিলের কাচের জিনিসপত্রগুলো সব ঝনঝনি করে উঠল, আর আমরা দুজনেই হুমড়ি খেয়ে পড়লাম টেবিলের উপর। তারপর কোনও রকমে টাল সামলে নিয়ে ফ্লাস্কের দিকে চোখ পড়তেই দেখলাম একটা আশ্চর্য জিনিস।

ফ্লাস্কের অর্ধেকটা ছিল জলে ভর্তি। প্রথমে লক্ষ করলাম যে, সেই জলের উপরের স্তরে একটা যেন ঢেউ খেলছে। অত্যন্ত ছোট ছোট তরঙ্গের ফলে জলের উপরটা যেন একটা সমুদ্রের খুদে সংস্করণ।

তারপর দেখলাম ইঞ্চিখানেক নীচের দিকে জলের মধ্যে কী যেন একটা চরে বেড়াচ্ছে। সেটাকে খালি চোখে প্রায় দেখা যায় না, কিন্তু সেটা পরমাণুর চেয়ে আয়তনে অনেকখানি বড়। আর তার চলার ফলে জলের ভিতরে যে একটা মৃদু আলোড়নের সৃষ্টি হচ্ছে, সেটা স্পষ্টই বোঝা যায়।

বাতিটা নেবাও!

হামবোল্টের হঠাৎ-চিৎকারে আমি চমকে উঠেছিলাম। আমার হাতের কাছেই লাইটের সুইচটা ছিল। সেটা নিবিয়ে দিতেই অন্ধকারে একটা অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখলাম। প্রাণীটির একটা নিজস্ব নীল আলো আছে, সেই আলোটা জলের ভিতরে একেবেঁকে চলে তার গতিপথ নির্দেশ করছে। আমরা দুজনেই মন্ত্রমুগ্ধের মতো ফ্লাস্কের দিকে চেয়ে রইলাম।

কতক্ষণ। এইভাবে চেয়েছিলাম জানি না। হঠাৎ ঘরের বাতিটা জ্বলে উঠতে বুঝলাম হামবোল্টের আচ্ছন্ন ভাবটা কেটেছে। সে ঘরের এক পাশে সোফাটার উপর ধাপ করে বসে পড়ল। তার ঘন ঘন হাত কচলানি থেকে বুঝলাম, সে এখনও উত্তেজনায় অস্থির।

আমি টেবিলের সামনেই কাঠের চেয়ারটায় বসে পড়ে বললাম, এমন একটা ঘটনা বৈজ্ঞানিক মহলে প্রচার করা উচিত নয় কি?

হামবোল্ট এ কথার কোনও উত্তর না দিয়ে কেবল হাত কচলাতে লাগল। বোধ হয় আমাদের আবিষ্কারের গুরুত্বটা সাময়িকভাবে তার মাথাটা একটু বিগড়ে দিয়েছে, সে পরিষ্কারভাবে কিছু ভাবতে পারছে না। তবু আমি একটা কথা না বলে পারলাম না

আমাদের এই প্রাণী যাতে কিছু দিন অন্তত বেঁচে থাকে, তার জন্য যা করা দরকার সেটা আমাদের করতেই হবে।

হামবোল্ট বার দুয়েক মাথা নেড়ে অদ্ভুতভাবে চাপা ফিসফিসে গলায় প্রায় অন্যমনস্কভাবে

এরপর থেকে হামবোল্ট আর দাবার উল্লেখ করেনি। কাল রাত্রে খাবার সময় সে একটি কথাও বলেনি। বেশ বুঝেছিলাম যে, তার অন্যমনস্কতা এখনও কাটেনি। কী ভাবছে সে, কে জানে!

আজ সারা দিন আমরা দুজন অনেকটা সময় কাটিয়েছি ল্যাবরেটরিতে। দিনের বেলায় ল্যাবরেটরির জানালাগুলো বন্ধ করে রেখেছি, যাতে ঘরটা অন্ধকার থাকে। অন্ধকারের মধ্যে যতবারই ঘরে ঢুকেছি, ততবারই প্রথমে চোখ চলে গেছে। ফ্লাস্কের ওই নীল এঁকেবেঁকে-চলা আলোটার দিকে। কী নাম দেওয়া যায়। এই জীবন্ত আলোকবিন্দুর? এখনও ভেবে ঠিক করতে পারিনি।

১৫ই মার্চ

আমার মাথা ভোঁ ভোঁ করছে, নিজেকে বৈজ্ঞানিক বলতে আর ইচ্ছে করছে না। হামবোল্টের ল্যাবরেটরিতে আজকে যে ঘটনা ঘটেছে, সেটা আমাদের দুজনকেই একেবারে বেকুব বানিয়ে দিয়েছে।

বিজ্ঞানের কোনও নিয়মই এখানে খাটে না। এটাকে অলৌকিক ভেলকি ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না।

আমি কাল রাত্রে ঘুমিয়েছি। প্রায় তিনটের সময়; কিন্তু তা সত্ত্বেও অভ্যাস মতো আমার ভোর পাঁচটায় ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। হামবোল্টও ভোরেই ওঠে, কিন্তু ছটার আগে নয়।

সটান চলে গেলাম। ল্যাবরেটরিতে।

দরজা জানোলা কাল বন্ধ ছিল। দরজার একটা ড়পলিকেট চাবি হামবোল্ট আমাকে দিয়ে রেখেছিল। দরজা খুলে ঘরে ঢুকে ফ্লাস্কের দিকে চাইতেই বুকটা ধড়াস করে উঠল।

সেই নীল আলোটা আর দেখা যাচ্ছে না। আমি তৎক্ষণাৎ ধরেই নিলাম যে, প্রাণীটার মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু তাও ব্যাপারটা একবার ভাল করে দেখার জন্য টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলাম।

আলো জ্বালাতেই প্রথমেই দেখলাম যে, ফ্লাস্কে জল প্রায় নেই বললেই চলে। তার বদলে প্রায় অর্ধেকটা অংশ ভরে রয়েছে একটা খয়েরি রঙের পদার্থে। এই পদার্থের উপরটা প্রায় সমতল; তারমধ্যে কয়েকটা ছোট ছোট জলে ভরা ডোবার মতো জায়গা, আর সেগুলোকে ঘিরে সবুজ রঙের ছোপ। অর্থাৎ যেটা ছিল সমুদ্র, সেটা এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে হয়ে গেছে। জলাভূমি।

কিন্তু আমাদের প্রাণী? এইবারে লক্ষ করলাম একটা ডোবার মধ্যে কিছুটা আলোড়ন। কী যেন একটা চলে ফিরে বেড়াচ্ছে সেখানে। আমি এগিয়ে গিয়ে একেবারে ফ্লাস্কের কাচের গায়ে চোখ লাগিয়ে দিলাম।

হ্যাঁ। কোনও সন্দেহ নেই। একটা প্রাণী ডোবার জলের মধ্যে সাঁতার দিয়ে ডাঙায় এসে উঠল। প্রাণীটাকে খালি-চোখেই দেখা যাচ্ছে। সাইজে একটা সাধারণ পিঁপড়ের মতো বড়।

আমার মুখ থেকে একটা কথা আপনা থেকে বেরিয়ে পড়ল—অ্যামফিবিয়ান।

অর্থাৎ আমাদের সৃষ্ট জলচর প্রাণী আজ। আপনা থেকেই উভচর প্রাণীতে পরিণত হয়েছে। এ প্রাণী জলেও থাকতে পারে, ডাঙাতেও থাকতে পারে। পৃথিবীতে যখন প্রথম প্রাণীর সৃষ্টি হয়, অনুমান করা হয় সে প্রাণী জলচর ছিল। তারপর প্রাকৃতিক অবস্থার পরিবর্তনে পৃথিবী থেকে জল কমে যায়; তার জায়গায় দেখা দেয় জলাভূমি। তার ফলে জলচর প্রাণীও ক্রমে নতুন পরিবেশে প্রাণধারণ করার উপযুক্ত একটা নতুন চেহারা নেয়। এই চেহারাটাই তার অ্যামফিবিয়ান বা উভচর চেহারা। এ জিনিসটা অবশ্য রাতারাতি হয়নি। এটা ঘটতে লেগেছিল। কোটি কোটি বছর। কিন্তু আমাদের ফ্লাস্কের মধ্যে ঠিক এই ঘটনাই ঘটে গেল দু দিনের মধ্যে।

টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে এইসব কথা ভাবছি, এমন সময় হঠাৎ লক্ষ করলাম যে, প্রাণীটা এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি তৎক্ষণাৎ মাইক্রোম্যাগনাস্কোপ দিয়ে সেটাকে একবার ভাল করে দেখে নিলাম। কোনও সন্দেহ নেই। ঠিক এই জাতীয় অ্যামফিবিয়ানেরই ফসিল আমি দেখেছি বার্লিন মিউজিয়মে। ৬০০ কোটি বছর আগে এই উভচর প্রাণী পৃথিবীতে বাস করত। মাছ আর সরীসৃপের মাঝামাঝি অবস্থা। রংটা লক্ষ করলাম সবুজ আর খয়েরি মেশানো। চেহারাটা যেন মাছ আর গিরগিটির মাঝামাঝি।

আরও একটা আশ্চর্য জিনিস লক্ষ করলাম। ডোবার ধারে ধারে যেটাকে সবুজ রং বলে মনে হচ্ছিল, সেটা আসলে অতি সূক্ষ্ম আকারের সব গাছপালা।

হামবোল্ট বোধ হয় অনেক রাত পর্যন্ত লেখালেখির কাজ করেছে, তাই তার ঘুম ভাঙতে হয়ে গেল সাড়ে সাতটা। বলা বাহুল্য, ফ্লাস্কের ভিতরে ভেলকি দেখে আমারই মতো হতবাক অবস্থা তারও।

ব্রেকফাস্ট খেতে খেতে হামবোল্ট প্রথম মুখ খুলল—আমাদের ফ্লাস্কের ভিতরে কি পৃথিবীর প্রাণীর ক্রমবিবর্তনের একটা মিনিয়েচার সংস্করণ ঘটতে চলেছে।

আমিও মনে মনে এটাই সন্দেহ করেছিলাম। বললাম, সেটা শুধু আজকের এই একটা ঘটনাতে প্রমাণ হবে না। এখন থেকে শুরু করে পর পর কী ঘটে, তার উপর সব কিছু নির্ভর করছে।

হুঁ।

হামবোল্ট কিছুক্ষণ চুপ। তার ঠোঁটের কোণে সেই অদ্ভুত হাসি, যেটা প্রথম প্রাণীর উদ্ভবের সময় থেকেই মাঝে মাঝে লক্ষ করছি। অবশেষে একটা সসেজের টুকরো মুখে পুরে চিবোতে চিবোতে বলল, তার মানে এর পরে উদ্ভিদজীবী সরীসৃপ। তারপর স্তন্যপায়ী মাংসাশী জানোয়ার, তারপর।..তারপর...

হামবোল্ট থামল। তারপর কাঁটাচামচ নামিয়ে রেখে হাত দুটো কচলাতে কচলাতে বলল, আজ থেকে সতেরো বছর আগে, ওসাকায় একটা আন্তজাতিক বিজ্ঞানীবৈঠকে কৃত্রিম উপায়ে প্রাণ সৃষ্টি করার বিষয়ে একটা প্রবন্ধ পড়ে ছিলাম। সে প্রবন্ধ শুনে সভার লোক আমায় ঠাট্টা করেছিল, পাগল বলে গালমন্দ করেছিল। আজ ইচ্ছে করছে, তারা এসে দেখুক আমি কী করেছি...

আমি চুপ করে রইলাম। বুঝলাম, হামবোল্ট প্রাণসৃষ্টির কৃতিত্বটা অম্লানবদনে নিজে একই নিয়ে নিচ্ছে। অথচ আমি জানি যে, যদি শেষ মুহূর্তে আমার মাথা না খেলত—বমবার্ডমেন্টের মাত্রা যদি না বাড়ানো হত— তা হলে পরীক্ষা সফল হত না। গবেষণার গোড়াতে

হামবোল্টের কথাতেই কাজ চলছিল, কিন্তু তাতে কোনও ফল হয়নি। সেটা হামবোল্টও জানে, কিন্তু তাও...

যাকগে। এ সবে কিছু এসে যায় না। বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে ছোট মনের পরিচয় আমি আগেও পেয়েছি। তারাও তো মানুষ, কাজেই তাদের অনেকের মধ্যেই ঈষাও আছে, লোভও আছে। এ নিয়ে আর কোনও মন্তব্য বা চিন্তা না করাই ভাল।

কদিন একটানা বাড়ির ভেতর থাকতে হয়েছে, তাই আজ দিনটা ভাল দেখে ভাবলাম, একটু বেড়িয়ে আসি। দু-একটা চিঠি লেখা দরকার, অথচ ডাকটিকিট নেই, তাই সোজা পোস্টাপিসের দিকে রওনা দিলাম।

রাস্তায় বরফ পড়ে আছে, শীতটাও চনমনে, কিন্তু আমার কোটের পকেটে একটা এয়ার কন্ডিশনিং পিল থাকার জন্য অতিরিক্ত গরমজামার কোনও প্রয়োজন হয়নি। বেশ বুঝতে পারছিলাম যে, ওভারকেট পরা রাস্তার লোকেরা আমার দিকে উদ্বিগ্নভাবে বার বার ফিরে ফিরে দেখছে।

পোস্টাপিসে টিকিট কেনার সময় মনে হল যে, এইখান থেকে ইচ্ছে করলে লন্ডনে টেলিফোন করা যায়। সোজা ডায়াল করলেই যখন নম্বর পাওয়া যায়, তখন আমার বন্ধু প্রফেসর সামারভিলকে একটা খবর দিলে কেমন হয়? সামারভিল বায়োকেমিস্ট; কৃত্রিম উপায়ে প্রাণী তৈরির ব্যাপারে এককালে তার সঙ্গে আমার চিঠি লেখালেখি হয়েছিল।

সামারভিলকে টেলিফোনে পেতে লাগল ঠিক এক মিনিট।

কোনওরকমে সংক্ষেপে তাকে ব্যাপারটা বললাম। সামারভিল যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না। একে কৃত্রিম প্রাণী, তার

উপরে দু দিনের মধ্যে জলচর থেকে উভচর। শেষটায় সামারভিল বলল, তুমি কোত্থেকে ফোন করছ? ইন্ডিয়া নয় নিশ্চয়ই?

বললাম, না না, তার চেয়ে অনেক কাছে। আমি আছি সেন্ট গালেনে।

কেন? সেন্ট গালেনে কেন? সামারভিল অবাক।

বললাম, প্রোফেসর হামবোল্টের ল্যাবরেটরিতে কাজ করছি আমি।

তিন সেকেন্ড কোনও কথা নেই। তার পর শোনা গেল—

হামবোল্ট? কর্নেলিয়াস হামবোল্ট? কিন্তু সে যে—লাইন কেটে গেল।

মিনিটখানেক চেষ্টা করেও কোনও ফল হল না। সামারভিলের বাকি কথাটা আর শোনা হল না। তবে এটা বুঝেছিলাম যে আমার সহকর্মীর নাম শুনে সে বেশ বিচলিত হয়ে পড়েছে!

কী আর করি? বাড়ি ফিরে এলাম। হামবোল্ট যে একটু গোলমেলে লোক, সে তো আমি নিজেও বুঝেছি। কিন্তু এটাও তো মনে রাখতে হবে যে তার মতো এমন ল্যাবরেটরিতে এমন একটা এক্সপেরিমেন্টের সুযোগ হামবোল্টই আমাকে দিয়েছে।

আজ সারাদিন ল্যাবরেটরিতে অনেকটা সময় কাটিয়েছি। আমি আর হামবোল্ট। মাইক্রোফোটোগ্রাফিক ক্যামেরা দিয়ে প্রাণীটার কয়েকটা ছবিও তুলেছি। এটা বেশ বুঝেছি যে, প্রাণীটিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আমাদের কিছুই করতে হবে না। তার জন্য অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ আপনা থেকেই ফ্লাস্কের ভিতর তৈরি হয়ে রয়েছে। সেই পরিবেশ বদল না হওয়া পর্যন্ত এ প্রাণী ঠিকই থাকবে।

১৬ই মার্চ

যা ভেবেছিলাম তাই। আজ সরীসৃপ। আমার প্রাণীর তৃতীয় অবস্থা। আয়তনে আগের প্রাণীর চেয়ে প্রায় দশগুণ বড়। মাইক্রোম্যাগনাস্কোপের প্রয়োজন হবে না। এমনি চোখে দেখেই বেশ বোঝা যাচ্ছে এর আকৃতি ও প্রকৃতি। এর চেহারা আমাদের কাছে অতি পরিচিত। পৃথিবীর অনেক জাদুঘরেই এই কঙ্কাল রয়েছে। সরীসৃপ শ্রেণীর মধ্যে আয়তনে যেটি সবচেয়ে বড় ছিল—এ হল সেই ব্রন্টোসরাস। সেই ষাট ফুট লম্বা দানবসদৃশ প্রাগৈতিহাসিক জানোয়ারের একটি দু ইঞ্চি সংস্করণ দিব্যি আমাদের ফ্লাস্কের ভিতরের জমিতে হাঁটছে, শুচ্ছে, বসছে, আর দরকার হলে খুদে খুদে গাছের খুদে খুদে ডাল পাতা চিবিয়ে চিবিয়ে খাচ্ছে।

খুব আপশোস হল একটা কথা ভেবে-কাল রাতটা কেন ফ্লাস্কের সামনে বসে রইলাম না? থাকলে নিশ্চয়ই পরিবর্তনটা চোখের সামনে দেখতে পেতাম। আজ স্থির করলাম যে যতক্ষণ না ফ্লাস্কের ভিতরে একটা কিছু ঘটে ততক্ষণ ল্যাবরেটরি ছেড়ে কোথাও যাব না। এখন রাত সোয়া বারোটা। আমি ল্যাবরেটরিতে বসেই আমার ডায়রি লিখছি। হামবোল্টও সামনে বসে আছে। কেবল মাঝে একবার টেলিফোন আসাতে উঠে চলে গিয়েছিল। কে ফোন করেছিল জানি না। যেই করুক, হামবোল্ট তার সঙ্গে বেশ উত্তেজিত ও উৎফুল্লভাবে কথা বলছিল। এটা মাঝে মাঝে তার উদাত্ত গলার স্বর থেকেই বুঝতে পারছিলাম, যদিও দুটো ঘরের মধ্যে ব্যবধানের ফলে কথা বুঝতে পারছিলাম না।

ব্রন্টোসরাসটা এখন বিশ্রাম করছে। ফ্লাস্কের ভিতরটা কেমন জানি ধোঁয়াটে হয়ে আসছে। হয়তো কিছু একটা ঘটবে। লেখা বন্ধ করি।

১৬ই মার্চ, রাত একটা বেজে ছত্রিশ মিনিট

দু মিনিট আগে সেই আশ্চর্য ঘটনাটা ঘটে গেল। যে ধোঁয়াটে ভাবটার কথা লিখেছিলাম সেটা আর কিছুই না-ফ্লাস্কের ভিতরে উপর দিকটায় মেঘ জন্মছিল। মিনিট পাঁচেক এইভাবে মেঘ জমার পর অবাক হয়ে দেখলাম একটা মিহি বাষ্পের মতো জিনিস মেঘ থেকে নীচে জমির দিকে নামছে। বুঝলাম সেটা বৃষ্টি। আমাদের ফ্লাস্কের ভিতরের ভূখণ্ডটির উপর বৃষ্টি হচ্ছে।

শুধু বৃষ্টি নয়। পর পর কয়েকটা বিদ্যুতের চমকও লক্ষ করলাম-আর সেই সঙ্গে মৃদু। মেঘের গর্জন। যদিও সে গর্জন কান ফাটা কোনও শব্দ নয়, কিন্তু ফ্লাস্কটা ও টেবিলের অন্যান্য কাচের যন্ত্রপাতি সেই গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে ঝনঝনি করে উঠছিল।

বৃষ্টির মধ্যে আমাদের প্রাণীর কী অবস্থা হচ্ছে, সেটা দেখার কোনও উপায় ছিল না, কারণ বাষ্পের জন্য ফ্লাস্কের ভিতরের সূক্ষ্ম ডিটেল সব ঢাকা পড়ে গিয়েছিল।

আমরা দুজনেই তন্ময় হয়ে দেখতে দেখতে একটা সময় এল যখন বুঝতে পারলাম বৃষ্টিটা থেমে গেছে। মেঘ কেটে গেল, বাষ্প সরে গিয়ে ফ্লাস্কের ভিতরটা আবার পরিষ্কার হয়ে গেল। দেখলাম জমির রং একেবারে বদলে গেছে। আগের অবস্থায় যা ছিল তামাটে, এখন সেটা হয়েছে। ধবধবে সাদা।

আমরা দুজনে একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলাম-বরফ!

বরফটা সমতল নয়। তার মধ্যে উঁচু নিচু আছে, এবড়োখেবড়ো আছে, এক এক জায়গায় বরফের চাই মাটি থেকে মাথা উঁচিয়ে রয়েছে পাহাড়ের মতো।

আমি বললাম, আমরা কি ফ্লাস্কের মধ্যে আইস-এজের একটা দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি!

হামবোল্ট বলল, তা হবেও বা। কিংবা যে কোনও সময়ের মেরুদেশের দৃশ্যও হতে পারে।

আইস-এজ বা তুষারপর্বের সময় হচ্ছে আজ থেকে সাত-আট লক্ষ বছর আগে। বরফ তখন মেরুদেশ থেকে নীচের দিকে সরতে সরতে প্রায় সারা পৃথিবীকে ঢেকে ফেলেছিল।

হামবোল্ট হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল—ওই যে! ওই যে আমাদের প্রাণী!

একটা বরফের গুহা থেকে বেরিয়ে এসেছে একটা লোমশ জানোয়ার। এক ইঞ্চির বেশি লম্বা নয়। সেটা। জানোয়ারটা চুপ করে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। হামবোল্ট মাইক্রোম্যাগনাস্কোপটা চোখে লাগল। তারপর চেঁচিয়ে উঠল–

বুঝেছি! স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। পাগুলো বেঁটে বেঁটে, মাথার সামনের দিকে দুটো শিং, ঘাড়ে-গদানে চেহারা। এ হল লোমশ গণ্ডার! আমাদের স্তন্যপায়ী জানোয়ার!

এবার আমি চোখে লাগালাম যন্ত্রটা। হামবোল্ট ঠিকই বলেছে। গণ্ডারের আদিম সংস্করণ-যাকে বলে Wooly Rhinoceros। বরফের দেশেই বাস করত এ জানোয়ার।

বুঝতে পারলাম, আমাদের ফ্লাস্কের ভিতরে এভোলিউশন বা ক্রমবিবর্তনের ধারা ঠিকই বজায় আছে। আজকের বিবর্তনের ঘটনাটা যে আমরা চোখের সামনে ঘটতে দেখছি, এটাই সবচেয়ে আনন্দের কথা। আমাদের ষোলো ঘণ্টা এক নাগাড়ে ল্যাবরেটরিতে বসে থাকা সার্থক হয়েছে।

কাল সকালে সামারভিলকে আরেকটা ফোন করে তাকে একবার আসতে বলব। এমন একটা অলৌকিক ঘটনা কেবলমাত্র দুটি

বৈজ্ঞানিকের সামনে ঘটে চলবে, এটা অন্যায়, এটা হতে দেওয়া চলে না।

১৭ই মার্চ

আজ সাংঘাতিক গণ্ডগোল। আজ আমাকে হত্যা করতে চেষ্টা করা হয়েছিল। ভাগ্যক্রমে এ যাত্রা বেঁচে গেছি, কিন্তু কী ধরনের বিপদসংকুল পরিবেশে আমাকে কাজ করতে হচ্ছে সেটা বেশ বুঝতে পারছি। কী হল সেটা গুছিয়ে লেখার চেষ্টা করছি।

সামারভিলকে আর একবার টেলিফোন করার কথা কালকেই মনে হয়েছিল। হামবোল্ট সম্পর্কে ও কী বলতে চেয়েছিল সেটা জানার জন্যও একটা কৌতূহল হচ্ছিল। সকালে ব্রেকফাস্ট খেয়ে বেরোতে যাব, এমন সময় হামবোল্ট জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাচ্ছ?

বললাম, গিরিডিতে আমি রোজ সকালে হাঁটতে বেরোই, তাই এখানে এসেও মাঝে মাঝে সেটার প্রয়োজন বোধ করি।

হামবোল্ট শুকনো গলায় বলল, সেদিন পোস্টাপিস থেকে কাকে টেলিফোন করেছিলে?

আমি তো অবাক। লোকটা জানল কী করে? সারা শহরে কি গুপ্তচর বসিয়ে রেখেছে নাকি হামবোল্ট?

আমার প্রশ্নটা বোধ হয় আচা করেই হামবোল্ট বলল, এ শহরের প্রত্যেকটি লোককে আমি চিনি, প্রত্যেকেই আমাকে সমীহ করে। আমার বাড়িতে একজন ভারতীয় বৈজ্ঞানিক অতিথি এসে রয়েছে, সে খবরও সকলে জানে। তাদের যে কোনও একজনের কাছ থেকে খবরটা আমার কানে আসাটা কি খুব অস্বাভাবিক?

আমি বললাম, অস্বাভাবিক নয় মোটেই। কিন্তু তোমার এভাবে আমাকে জেরা করাটা আমার অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে। তবু-যখন জিজ্ঞেস করছ, তখন বলছি-আমার এক বন্ধুকে ফোন করেছিলাম।

কোথায়?

লন্ডনে।

সে কি বৈজ্ঞানিক?

হ্যাঁ।

কী বলেছিলে তাকে?

আমার ভারী বিরক্ত লাগল। লোকটা ভেবেছে কী? হতে পারে। আমি তার অতিথি; হতে পারে সে আমাকে তার ল্যাবরেটরিতে তার সঙ্গে একজোটে কাজ করার সুযোগ দিয়েছে; কিন্তু তাই বলে কি সে আমায় কিনে রেখেছে? আমার নিজের কোনওই স্বাধীনতা নেই? বললাম, দুজন বন্ধুর মধ্যে কী কথা হচ্ছিল, সেটা জানার জন্য তোমার এত কৌতূহল কেন বুঝতে পারছি না।

হামবোল্ট চাপা অথচ কর্কশ গলায় বলল, কৌতূহল হচ্ছে এই কারণেই যে আমার ল্যাবরেটরিতে যেটা ঘটছে, সেটা সম্বন্ধে কোনও মিথ্যে খবর বাইরে প্রচার হয় সেটা আমি চাই না।

মিথ্যে খবর বলতে তুমি কী বোঝা?

হামবোল্ট এতক্ষণ চেয়ারে বসেছিল। এবার সে চেয়ার ছেড়ে উঠে আমার দিকে এগিয়ে এসে, আমার মুখের সামনে মুখ এনে সাপের মতো ফিসফিসে গলায় বলল, পৃথিবীর ইতিহাসে মানুষের হাতে

প্রথম প্রাণ সৃষ্টির সমস্ত কৃতিত্ব হল কর্নেলিয়াস হামবোল্টের। এ কথাটা যেন মনে থাকে।

বুঝতে পারলাম, সামারভিলকে ফোনটা আর করা হবে না। মুখে কিছু বললাম না, যদিও লোকটাকে চিনতে আর বাকি ছিল না। কিন্তু একবার যখন বেরোব বলেছি, তখন বেরোলাম। গেট থেকে বেরিয়ে এসে বাঁ দিকের রাস্তায় শহরের দিকে না গিয়ে ডান দিকের রাস্তাটা ধরে পাহাড়ের উপর দিকটায় চললাম। এ রাস্তাটা দিয়ে প্রথম দিনই বেড়িয়ে এসেছিলাম। কিছু দূর গেলেই একটা সুন্দর নিরিবিলি বার্চের বন পড়ে। সেখানে একটা বেঞ্চিতে বসলে দুহাজার ফুট নীচে কনস্ট্যানস লেক দেখা যায়।

বার্চ বনে পৌঁছে বেঞ্চিটা খুঁজে বার করে বসতে যাব, এমন সময় কনের পাশ দিয়ে তীক্ষ্ণ শিসের মতো শব্দ করে কী যেন একটা জিনিস তিরবেগে বেরিয়ে গিয়ে আমার তিন হাত দূরে একটা বার্চ গাছের গুড়িতে গিয়ে বিঁধে গেল।

সেই মুহূর্তেই পিছন ফিরে দেখতে পেলাম একটা ব্রাউন কোট পরা লোক প্রায় একশো গজ দূরে এক দৌড়ে একটা ঝোপের পিছনে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমি প্রায় কোনও অবস্থাতেই নাভসি হই না। এখনও হলাম না। বেঞ্চি ছেড়ে গাছটার দিকে গিয়ে তার গায়ে টাটকা নিখুঁত গর্তটা পরীক্ষা করে দেখলাম। যদিও কোনও বন্দুকের আওয়াজ আমি পাইনি, এটা বেশ বুঝতে পারলাম যে, গর্তটা হয়েছে গুলি লাগার ফলেই। অস্ত্রটিও যে মোক্ষম—সেটা বুঝতে বাকি রইল না, কারণ গুলি গুড়ির একদিক দিয়ে ঢুকে বেমালুম অন্য দিক দিয়ে বেরিয়ে চলে গেছে।

আমি আর অপেক্ষা না করে ধীর পদক্ষেপে বাড়ির দিকে রওনা হলাম।

হামবোল্টের বাড়ির গেট দিয়ে ঢুকেই দেখতে পেলাম চাকর ম্যাক্সকে। তার গায়ে একটা ব্রাউন চামড়ার জ্যাকেট। ম্যাক্স আমাকে দেখে যেন কিছুই হয়নি এমন ভাব করে গেট দিয়ে বেরিয়ে শহরের দিকে চলে গেল।

বাড়িতে ঢুকে বৈঠকখানার দিকে যেতেই দেখলাম হামবোল্ট দুজন অচেনা ভদ্রলোকের সঙ্গে বসে কথা বলছেন। আমাকে দেখে নির্বিকারভাবে তিনি ডাক দিলেন—কাম ইন, প্রোফেসর শঙ্কু।

আমি নির্বিকারভাবেই বৈঠকখানায় গিয়ে ঢুকলাম। আগন্তুক দুটি উঠে দাঁড়ালেন। একজন ছোকরা, অন্যটি মাঝবয়সি। তাদের হাতে খাতা-পেনসিল দেখে আন্দাজ করলাম তারা খবরের কাগজের রিপোর্টার। হামবোল্টের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের মাঝখানে আমি এসে পড়েছি। হামবোল্ট আমার পরিচয় দিলেন, এবং যেভাবে দিলেন, তাতে বুঝলাম যে লোকটার ধৃষ্টতা একেবারে চরমে পৌঁছে গেছে।

ইনিই হচ্ছেন আমার ভারতীয় অ্যাসিস্ট্যান্ট, যার কথা আপনাদের বলছিলাম।

আমি করমর্দন করে একটা ভদ্রতাসূচক মৃদু হাসি হেসে এক্সকিউজ মি বলে ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা ল্যাবরেটরিতে চলে গেলাম।

টেবিলের কাছে পৌঁছে ফ্লাস্কের দিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠলাম।

বরফ আর নেই। তার জায়গায় এখন রয়েছে একটা সবুজ বন, আর সেই বনে ঘোরাফেরা করছে আর একটি নতুন প্রাণী, যার নাম বানর। যাকে বলা হয় প্রাইমেট। যিনি হলেন মানুষের পূর্বপুরুষ।

কথাটা মনে হতেই বুকের ভিতরটা কী রকম যেন করে উঠল।

এর পরেই কি তা হলে মানুষের দেখা পাব ফ্লাস্কের মধ্যে? ক্রমবিবর্তনের নিয়ম যেভাবে মেনে চলেছে আমাদের প্রাণী, তাতে তো মনে হয় বানরের পরে মানুষের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী। হামবোল্ট কি দেখেছে ফ্লাস্কের এই বানরকে?

তারপরেই মনে হল, আজকে বার্চ বনে আমাকে লক্ষ্য করে মারা নিঃশব্দ বন্দুকের কথা। হামবোল্ট চাইছে না। আমি বেঁচে থাকি। ম্যাক্সের কাছে অস্ত্র আছে। প্রভুভক্ত ম্যাক্স একবার ব্যর্থ হয়েছে বলে দ্বিতীয়বারও হবে এমন কোনও কথা নেই।

শয়তানির বিরুদ্ধে শয়তানি প্রয়োগ করা ছাড়া হামবোল্ট আমার জন্য আর কোনও রাস্তা রাখছে না।

আমি দোতলায় আমার ঘরে চলে গেলাম। আমার অমনিস্কোপটা বার করে চোখে লাগিয়ে জানালার ধারে চেয়ারটায় গিয়ে বসলাম। আমার এই চশমাটাকে ইচ্ছামতো মাইক্রোস্কোপ, টেলিস্কোপ অথবা এক্সরেস্কোপ হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

আমার জানালা থেকে বাড়ির সামনের গোটটা দেখা যায়।

পৌনে দশটার সময় ম্যাক্স বাড়ি ফিরল। তার হাতে বাজার থেকে কিনে আনা জিনিসপত্র।

পাঁচ মিনিট পরে আমি কলিং বেল টিপলাম। এক মিনিটের মধ্যে ম্যাক্স ঘরে এসে হাজির।

আমাকে এক কাপ কফি এনে দিতে পারবে? বললাম ম্যাক্সকে।

যে আজ্ঞে বলে ম্যাক্স ঘাড়টাকে সামান্য নুইয়ে কফি আনতে চলে গেল। আমার চোখে এক্স-রে চশমা। সে চশমা ম্যাক্সের চামড়ার

কোট ভেদ করে আমাকে দেখিয়ে দিল তার ভেস্ট পকেটে রাখা লোহার পিস্তলটা।

কিছুক্ষণের মধ্যে ম্যাক্স কফি সমেত হাজির। ট্রে-টা টেবিলে নামিয়ে রাখার পর আমি তাকে বললাম, ম্যাক্স, আলমারির চাবিটা খুঁজে পাচ্ছি না; তোমার কোর্টের বাঁ পকেটে যে চাবির গোছোটা আছে, তার মধ্যে কোনওটা ওতে লাগবে কি?

ম্যাক্সের মুখ হাঁ হয়ে গেল, এবং সেই হাঁ অবস্থাতেই সে একদৃষ্টি আমার দিকে চেয়ে রইল। হেসে বললাম, আমি ইন্ডিয়ার লোক, জানি তো? আমাদের অনেকের মধ্যেই নানারকম অস্বাভাবিক ক্ষমতা থাকে। তুমি অবাক হচ্ছি। কেন?

ম্যাক্স তোতলাতে শুরু করল। আপনি আ-মারি প-পকেটে কী আছে...

আরও জানি। শুধু তোমার বাঁ পকেটে কেন—ডান পকেটে খুচুরো পয়সাগুলোকে দেখতে পাচ্ছি, আর ভেতরের ভেস্ট পকেটে পিস্তলাটা-যেটা দিয়ে তুমি আমায় খুন করতে গিয়েছিলে। ভারী অন্যায় করেছিলে তুমি। দেখলে তো আমাকে মারা অত সহজ নয়। এখন কত দেবতার কত অভিশাপ পড়বে তোমার উপর, সেটা ভেবে দেখেছি?

ম্যাক্স দেখি ঠক ঠক করে কাঁপতে শুরু করেছে। এই শীতের মধ্যেও তার কপালে ঘাম ছুটিছে। মনে মনে আমার হাসি পেলেও বাইরে একটা কঠোর গভীর্য অবলম্বন করে বসে রইলাম।

ম্যাক্স হঠাৎ ধাপ করে হাঁটু গেড়ে কাঠের মেঝের উপর বসে পড়ল। তারপর তার কম্পমান ডান হাত জ্যাকেটের ভিতর থেকে পিস্তলটি বার করে আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে কাঁদো কাঁদের সুরে বলল, দোহাই আপনার-এর জন্যে আমাকে দায়ী করবেন না। আমি

শুধুমানবের হুকুম পালন করেছি। না করলে নিস্তার পাব না, তাই করেছি। আমার অপরাধ নেবেন না-দোহাই আপনার! আমার মনিবকে আপনি চেনেন না। উনি বড় সাংঘাতিক লোক। আমি এ চাকরি থেকে রেহাই পেলে বাঁচি.

আমি পিস্তলটি ম্যাক্সের হাত থেকে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখলাম। সেটা যে হামবোল্টেরই তৈরি, সেটা বুঝতে পারলাম। বললাম, এর গুলি নেই তোমার কাছে?

আজেজ্ঞ না। একটি মাত্র ছিল, সেটা আজ সকালে খরচ করে ফেলেছি। গুলি তো আমার মনিব নিজেই তৈরি করেন।

বললাম, তোমার মনিব আবার তোমার কাছে পিস্তল ফেরত চাইবেন না তো?

মনে হয় না। ওটা আমার কাছেই থাকে। আমি শুধু ওঁর চাকর নই। ওঁর দেহরক্ষীর কাজও আমাকে করতে হয়।

ম্যাক্স চলে গেল। আমিও হাঁপ ছেড়ে চোখ থেকে অমনিস্কোপটা খুলে পকেটে রেখে কফিতে চুমুক দিলাম। মনে মনে স্থির করলাম, এখন আর ঘর থেকে বেরোব না। হামবোল্টের মুখ দেখতেও ইচ্ছে করছিল না। সেও এখন আর আমার ঘরে আসবে না বলেই আমার বিশ্বাস। দেখা হবে সেই একেবারে লাঞ্চের সময়।

১৯শে মার্চ

গত দুদিনের ঘটনা এত বিচিত্র, এত বিস্ময়কর ও এত আতঙ্কজনক যে সবটুকু গুছিয়ে লেখা আমার মতো অ-সাহিত্যিকের পক্ষে একটা দুরূহ কাজ। ভাগ্যে সামারভিল এসে পড়েছে। একজন সহৃদয় সমঝদার বন্ধুকে কাছে পেয়ে তবু মনে একটু বল পাচ্ছি। ভাবছি, ফেরার পথে সাসেক্সে ওর কাস্ট্রি হাউসে কিছুদিন কাটিয়ে যাব।

ওরাও তাই ইচ্ছে। সত্যি বলতে কী, বিষাক্ত গ্যাসের ফলে শরীরটাও একটু কাবু হয়েছে। সরাসরি দেশে না ফেরাই ঙ্গল!

পরশু—অর্থাৎ ১৭ই-লাঞ্চের সময় হামবোল্টের সঙ্গে দেখা হল। খেতে বসে লক্ষ করলাম, লোকটার মেজাজটা বেশ খোশ বলে মনে হচ্ছে। তার ফলে খাওয়ার পরিমাণ আর তৃপ্তিটাও যেন বেশ বেড়ে গেছে। তার কথা শুনে বুঝলাম যে, সে ভী ভেল্ট সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের শুধু তার সফল পরীক্ষার কথাই বলেনি, তাদের ল্যাবরেটরিতে নিয়ে গিয়ে প্রাণীর-অর্থাৎ মানুষের পূর্বপুরুষের—চেহারাটাও দেখিয়ে নিয়ে এসেছে। কাগজে নাকি খুব ফলাও করে হামবোল্টের কৃতিত্বের কথা লেখা হবে।

আমার পকেটে হামবোল্টের তৈরি মারণাস্ত্র; চাকর ম্যাক্স মনিবপক্ষ ছেড়ে আমার দিকে চলে এসেছে। কাজেই আমারও খাওয়ার কোনও কমতি হল না।

অন্য সব পদ শেষ করে যখন আপেলের কাস্টার্ড খাচ্ছি, তখন হামবোল্ট হঠাৎ বলল, তুমি কবে দেশে ফেরার কথা ভাবিছ?

বুঝলাম, আমার সান্নিধ্য আর হামবোল্টের পছন্দ হচ্ছে না। বললাম, প্রাণীটার চরম পরিণতি সম্পর্কে একটা স্বাভাবিক কৌতূহল আছে বুঝতেই পারছি। সেটা দেখেই ফিরে যাব।

আই সি…

এর পরে আর হামবোল্ট কোনও কথা বলেনি।

বিকেলে বার্চ বনে আর একটু বেড়িয়ে এসে সন্ধ্যা ছটা নাগাদ আবার ল্যাবরেটরিতে হাজির হলাম। গিয়ে দেখি, হামবোল্ট কাঠের চেয়ারটায় চুপটি করে বসে একদৃষ্টি ফ্লাস্কের দিকে চেয়ে আছে।

কিছুক্ষণ থেকেই আকাশে মেঘ জন্মছিল। এবারে দেখলাম, জানালা দিয়ে মাঝে মাঝে বিদ্যুতের ঝিলিক দেখা যাচ্ছে।

ফ্লাস্কের ভিতরে এখনও আদিম বনে আদিম বানর ঘুরে বেড়াচ্ছে। পরিবর্তন কোন সময় হবে, বা আদৌ হবে কি না, সেটা জানার কোনও উপায় নেই। ঘরের কোণে একটা গোল টেবিলের উপর থেকে একটা ফরাসি পত্রিকা তুলে নিয়ে সোফায় বসে পাতা উলটোতে লাগলাম।

বৈঠকখানার ঘড়িতে ঢং ঢেং করে সাতটা বাজার আওয়াজ পেলাম। বাইরে অন্ধকার। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়ার শব্দ শুরু হয়েছে। নেপোলিয়নটা একবার গভীর গলায় ডেকে উঠল।

বসে থাকতে থাকতে বোধ হয় সামান্য তন্দ্রা এসে গিয়েছিল। হঠাৎ একটা বিশ্রী শব্দে একেবারে সজাগ হয়ে উঠলাম।

হাম্‌বোল্ট চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ফ্লাস্কের দিকে ঝুঁকে পড়েছে—তার বিস্ফারিত, ঠোঁট দুটো ফাঁক। আওয়াজটা তারই মুখ দিয়ে বেরিয়েছে সেটাও বুঝতে পারলাম।

আমি সোফা ছেড়ে উঠে ফ্লাস্কটার দিয়ে এগিয়ে গেলাম।

গিয়ে দেখি তার ভিতরে এখন সম্পূর্ণ নতুন দৃশ্য, নতুন পরিবেশ। বন নেই, মাটি নেই, গাছপালা নেই, কিছু নেই। তার বদলে আছে একটা মসৃণ সমতল মেঝে, তার উপরে দাঁড়িয়ে আছে একটি এক ইঞ্চি লম্বা প্রাণী।

এই প্রাণীর উদ্ভব হয়েছে বানর থেকে। অর্থাৎ এই প্রাণী হল মানুষ। কী রকম চেহারা ফ্লাস্কের এই মানুষটির?

হামবোল্টের কম্পমান হাত থেকে মাইক্রোম্যাগনাস্কোপটা প্রায় পড়ে যাচ্ছিল। আমি সেটাকে নিয়ে চোখে লাগাতেই প্রাণীর চেহারাটা আমার কাছে স্পষ্ট হল।

মানুষটি বয়সে বৃদ্ধ। পরনে কোট-প্যান্ট, মাথায় চুল নেই বললেই চলে, তবে দাড়ি-গোঁফ আছে, আর চোখে এক জোড়া সোনার চশমা। প্রশস্ত ললাট, চোখে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সঙ্গে মেশানো একটা শান্ত সংযত ভাব।

এ লোকটাকে আমি আগে অনেকবার দেখেছি। আয়নায়। ইনি হলেন স্বয়ং ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কুর একটি অতি-সংক্ষিপ্ত সংস্করণ।

অর্থাৎ—আমার তৈরি মানুষ দেখতে ঠিক আমারই মতন।

দেখা শেষ করে মাইক্রোম্যাগনাস্কোপটা টেবিলের উপর রেখে দেওয়া মাত্র খেয়াল হল যে, হামবোল্ট আর আমার পাশে নেই। সে হঠাৎ কোথায় যেতে পারে ভাবতে না ভাবতেই দুম দুম করে দুটো প্রচণ্ড শব্দে ল্যাবরেটরির দুটো দরজা বাইরে থেকে বন্ধ হয়ে গেল। আর তারপরেই জানোলা দুটো। বুঝলাম যে আমি বন্দি হয়ে গেলাম।

হামবোল্টের কী মতলব জানি না। পরীক্ষার সাফল্যের জন্য যে আমিই দায়ী তার এমন জলজ্যান্ত প্রমাণ পেয়ে নিশ্চয়ই সে একেবারে উদভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। হয়তো আমাকে হত্যা করার রাস্তা খুঁজছে সে। অস্ত্র সংগ্রহ করে হত্যার জন্য প্রস্তুত হয়ে তবে সে দরজা খুলবে।

কী হবে যখন জানা নেই, তখন ভেবে কোনও লাভ নেই। তার চেয়ে বরং আমার কয়েদখানার পরিবেশটা একবার ভাল করে দেখে নিই।

একদিকে টেবিলের উপর বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, তারমধ্যে ফ্লাস্ক, তারমধ্যে খুদে-আমি। তার ডান পাশের দেয়ালে দুটো বন্ধ দরজার

মাঝখানে একটা বইয়ের আলমারি, তার পরের দেয়ালে দুটো বন্ধ জানালার মাঝখানে একটা রাইটিং ডেস্ক। অন্য দেয়ালটার সামনে সোফা, আর তার পাশে ঘরের কোণে একটা নিচু গোল টেবিল। পালাবার কোনও পথ নেই।

মনে পড়ল আমার সর্বনাশী ব্রহ্মাস্ত্র অ্যানাইহিলিন পিস্তলটা গিরিডিতে রেখে এসেছি। আমার সঙ্গে হামবোল্টের পিস্তলটা রয়েছে, কিন্তু সেটাও গুলির অভাবে অকেজো। কী আর করি? কাঠের চেয়ারটার উপর বসে। ফ্লাস্কের ভিতরে আশ্চর্য প্রাণীটার দিকে মন দিলাম।

খুদে শঙ্কু কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে রইল। তারপর দেখলাম হাত দুটোকে পিছনে করে পায়চারি আরম্ভ করল। মনে পড়ল আমিও চিন্তিত হলে ঠিক এইভাবেই পায়চারি করি। দৃশ্যটা আমাকে আবার এমন অবাক করে তুলল যে আমি আমার বিপদের কথা প্রায় ভুলেই গেলাম।

কতক্ষণ এইভাবে তন্ময় হয়ে ফ্লাস্কের দিকে চেয়ে ছিলাম জানি না। হঠাৎ খেয়াল হল যে আমার দৃষ্টি কেমন জানি ঝাপসা হয়ে আসছে। তারপর বুঝতে পারলাম যে সেটার কারণ আর কিছুই না—কোথা থেকে জানি ঘরের মধ্যে একটা বাষ্প জাতীয় কিছু ঢুকছে। একটা তীব্র বিশ্রী গন্ধ নাকে এসে প্রবেশ করছে।

চারিদিকে আর একবার ভাল করে দেখে অবশেষে বুঝতে পারলাম, কোথা দিয়ে এই গ্যাসটা আসছে। ল্যাবরেটরির দুষিত বায়ু বাইরে যাবার জন্য একটা চিমনি রয়েছে টেবিলটার পিছন দিকে। সেটা চলে গেছে বাড়ির ছাত অবধি। সেই চিমনির মুখটা দিয়েই এই দুর্গন্ধ গ্যাস ঘরে এসে ঢুকছে।

আমি নাকে রুমাল চাপা দিলাম। গ্যাস ক্রমে বাড়ছে। সবুজ ধোঁয়ায় ঘর ক্রমে ছেয়ে যাচ্ছে। আমার চোখে অসহ্য জ্বালা। নিশ্বাসের কষ্ট

হচ্ছে। তার মধ্যেই বুঝতে পারছি এটা সেই সাংঘাতিক কাবোঁডিমন গ্যাস-যাতে মানুষ পাঁচ মিনিটের মধ্যে খাবি খেয়ে দম আটকিয়ে মরে যায়।

আমি আর চেয়ারে বসে থাকতে পারছিলাম না। উঠে দাঁড়ালাম। রুমালে কোনও কাজ দিচ্ছে না। ঘরের যন্ত্রপাতি টেবিল চেয়ার, এমনকী আমার সামনে ফ্লাস্কটা পর্যন্ত অদৃশ্য হয়ে আসছে। একটা অন্ধকার পরদা নেমে আসছে আমার সামনে। আমি দাঁড়িয়েও থাকতে পারছি না। আমার সামনে টেবিল। আমি টেবিলের ওপরেই হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। আমার বেড়ালের কথা মনে হচ্ছে.প্রহ্লাদ...গিরিডি.আমার বাগান...গোলঞ্চ

কী যেন একটা ঝলসে উঠল আমার চোখের সামনে। এক বিঘাতের মধ্যে। সেই ঝলসানিতে স্পষ্ট দেখলাম ফ্লাস্কটা। তাতে আর খুদে-শঙ্কু নেই। তার জায়গায় পর পর তিনবার বৈদ্যুতিক স্পার্ক খেলে গেল। বুঝলাম আমি আমার দৃষ্টি ফিরে পাচ্ছি, শরীরে বল পাচ্ছি, সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছি। ঘরের ভিতর থেকে গ্যাস দূরীভূত হচ্ছে, দুর্গন্ধ চলে যাচ্ছে, ধোঁয়াটে ভাবটা ক্রমশ কমে আসছে। আমার অবাক দৃষ্টি এখনও ফ্রাস্কের ভিতর। পরিবেশ বদলে গেছে। সিমেন্টের বদলে এখন একটা স্বচ্ছ কাচ কিংবা প্লাস্টিকের মাঝে যেখানে স্পার্ক হচ্ছিল, সেখানে এখন নতুন প্রাণীর উদ্ভব হয়েছে।

এমন প্রাণী আমি জীবনে কখনও দেখিনি। লম্বায় দুইঞ্চির বেশি নয়, তার মধ্যে মাথাটাই এক ইঞ্চি। শরীরে রামধনু রঙের পোশাকটা পা থেকে গলা অবধি গায়ের সঙ্গে সাঁটা। নাক কান ঠোঁট বলতে কিছুই নেই। চোখ দুটো জ্বলন্ত অথচ স্নিগ্ধ আগুনের ভাঁটা। মাথা জোড়া মসৃণ সোনালি টাক। হাত দুটো কনুইয়ের কাছে এসে শেষ হয়ে গেছে। তাতে আঙুল আছে কি না বোঝা যাচ্ছে না।

আমি আরও এগিয়ে গিয়ে ভাল করে প্রাণীটাকে দেখব, এমন সময় ঘরের একটা দরজা খুলে গেল।

হামবোল্ট, আর তার পিছনে তার গ্রেট ডেন হাউন্ড নেপোলিয়ন।

হামবোল্ট আমাকে দেখেই একেবারে হতভম্ব হয়ে গেল। বোঝাই গেল, সে আমাকে জ্যান্ত দেখতে পাবে সেটা আশাই করেনি।

গ্যাস? গ্যাস কী হল? সে বোকার মতো বলে উঠল।

আমি বললাম, আপনা থেকেই উবে গেছে।

সুঃ নেপোলিয়ন।

হামবোল্ট এটা বলার সঙ্গে সঙ্গে ওর। ওই বিশাল কুকুরটা একটা হিংস্র গর্জন করে দাঁত খিঁচিয়ে একটা লম্ফ দিল আমাকে লক্ষ্য করে।

কিন্তু আমার কাছ পর্যন্ত পৌঁছাল না। শূন্যে থাকা অবস্থাতেই একটা তীব্র রশ্মি এসে তার গায়ে লেগে তাকে তৎক্ষণাৎ ধরাশায়ী করে দিল। রশ্মিটা এসেছে ফ্লাস্কের ভিতর থেকে।

এবার হামবোল্ট নেপোলিয়ান বলে একটা চিৎকার দিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকে কুকুরটার দিকে একবার দেখে টেবিলের উপর থেকে একটা মারাত্মক অ্যাসিডের বোতল তুলে নিয়ে সেটা আমার দিকে উঁচিয়ে তুলতেই তারও তার কুকুরের দশাই হল। ফ্লাস্কের ভিতর সদ্যোজাত অদ্ভুত প্রাণীটা ওই বিরাট জামান বৈজ্ঞানিককেও তার আশ্চর্য রশ্মির সাহায্যে নিমেষে ঘায়েল করল।

হামবোল্ট এখন তার পোষা কুকুরের উপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। পরীক্ষা করে দেখলাম, দুজনের একজনও মরেনি, কেবল সম্পূর্ণভাবে অচেতন।

এই ঘটনার ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সামারভিল এসে হাজির। সব শুনেটুনে সে বলল, হাম্‌বোল্ট প্রায় বছর দশেক উন্মাদ অবস্থায় গারদে কাটিয়েছিল, তারপর ভাল হয়ে ছাড়া পায় কিন্তু সেই সময় থেকেই বৈজ্ঞানিক মহলে তার সমাদর কমে যায়। গত কয়েক বছর ধরে যেখানে সেখানে বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে সে আমন্ত্রিত না হয়েও গিয়ে হাজির হয়েছে। পাছে আবার পাগলামিগুলো দেখা দেয়, তাই ওকে আর কেউ ঘটায় না। তুমি ব্যাপারটা জানতে না শুনে আমার আশ্চর্য লাগছে। সেদিনই তোমাকে টেলিফোনে সাবধান করে দিতাম, কিন্তু লাইনটা কেটে গেল। তাই ভাবলাম, নিজেই চলে আসি।

দোতলায় আমার ঘরে বসে কফি খেতে খেতে এই সব কথা হচ্ছিল। হামবোল্ট ও তার কুকুরকে তাদের উপযুক্ত দুটি আলাদা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তাদের শক লেগেছে মস্তিষ্কে। কতদিনে সারবে বলা যায় না।

সামারভিল এসেই ফ্লাস্কের আশ্চর্য প্রাণীটাকে দেখেছিল। দুজনেই বুঝেছিলাম যে, এটাই হল মানুষের পরের অবস্থা; যদিও কত হাজার বা কত লক্ষ বছর পরে মানুষ এ চেহারা নেবে সেটা জানার উপায় নেই।

কফি খাওয়া শেষ করে আমরা দুজনেই স্থির করলাম যে খুদে-সুপারম্যান বা অতি-মানুষটি কী অবস্থায় আছে একবার দেখে আসা যাক। ল্যাবরেটরির দরজা খুলে ভেতরে ঢুকেই আবার একটা অপ্রত্যাশিত অবাক দৃশ্য আমাদের চোখে পড়ল।

সমস্ত ফ্লাস্কের ভিতরটা এখন একটা লালচে আভায় ভরে আছে। সূর্য্যস্তের পর মাঝে মাঝে আকাশটা যে রকম একটা বিষণ্ন আলোয় ভরে যায়, এ যেন সেই আলো। স্বচ্ছ প্লাস্টিকের মেঝের বদলে এখন দেখতে পেলাম বালি, আর সেই বালির উপর একটা চ্যাপটা

আঙুরের মতো জিনিস নিজীবিভাবে পড়ে রয়েছে। কাছে গিয়ে দেখলাম, তার মধ্যে একটা মৃদু স্পন্দনের আভাস লক্ষ করা যাচ্ছে।

এটাও কি প্রাণী? এটাও কি মানুষের আরও পরের একটা অবস্থা? যে অবস্থায় মানুষের উত্তরপুরুষ একটা মাংসপিণ্ডের মতো মাটিতে পড়ে থাকবে, তার হাত থাকবে না পা থাকবে না, চলবার, কাজ করবার, চিন্তা করবার শক্তি থাকবে না, কেবল দুটি প্রকাণ্ড চোখ দিয়ে সে পৃথিবীর শেষ অবস্থাটা ক্লান্তভাবে চেয়ে চেয়ে দেখবে?

সামারভিল বলল, এ দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি না শঙ্কু। একটা কিছু করো।

কিন্তু কিছু করতে আর হল না। আমরা দেখতে দেখতেই চোখের সামনে একটা ক্ষীণ বাঁশির মতো শব্দের সঙ্গে সেই আলো, সেই বালি আর সেই মাংসপিণ্ড, সব কিছু মিলিয়ে গিয়ে ক্রমবিবর্তনের শেষ পর্ব শেষ হয়ে পড়ে রইল। শুধু একটি কাচের ফ্লাস্ক আর তার সামনে দাঁড়ানো দুটি হতভম্ব বৈজ্ঞানিক!